কিশোরদের জন্য রহস্য ও শিক্ষামূলক গল্প

# বন্ধ ঘড়ির রহস্য

একটি
পুরোনো ঘড়ি,
তিন বন্ধু
আর এক
অদ্ভুত রহস্য...

সময়
থেমে গেলেও
সত্য থেমে থাকে না...

একটি অনুপ্রেরণার গল্প

ক্যাটালগ
পাবলিকেশনস
www.catalog.com.bd

অধ্যায় ১

# যে ঘড়ি বন্ধ ছিল

বাড়িটা প্রায় একশো বছরের পুরোনো। শহরের ব্যস্ত রাস্তা থেকে একটু দূরে, বড় বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা সেই বাড়িটাকে এলাকার সবাই “সেনবাড়ি” নামে চিনত। দিনের বেলায়ও বাড়িটির চারপাশে এক ধরনের শান্ত নীরবতা লেগে থাকত। পুরোনো দেয়ালে শ্যাওলা, জানালার কাঠে ধুলো আর বারান্দার রেলিংয়ে জড়িয়ে থাকা লতাগাছ দেখে মনে হতো, বাড়িটি যেন অনেক দিনের কোনো গল্প নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।

বাড়িটায় এখন আর কেউ থাকে না। শুধু সপ্তাহে দু-এক দিন এসে বাড়ির দেখাশোনা করতেন বৃদ্ধ করিম চাচা। এলাকার ছোটরা বাড়ির কাছে খুব একটা যেত না। কেউ বলত, বাড়ির ভেতরে অদ্ভুত শব্দ শোনা যায়; কেউ বলত, রাতে ওপরের জানালায় আলো দেখা যায়। অবশ্য এসব কথার কোনো প্রমাণ কারও কাছে ছিল না।

এক বিকেলে রাফি, নীলয় আর তূর্য স্কুল থেকে ফিরছিল। তারা তিনজন একই ক্লাসে পড়ে এবং নতুন কোনো রহস্য দেখলেই সেটার পেছনে ছুটে বেড়ায়। সেনবাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ তূর্য থেমে গেল। “তোরা কি শব্দটা শুনলি?” রাফি কান পেতে বলল, “কী?” তূর্য এবার আরও মন দিয়ে শুনল। “টিক… টিক… টিক…” তিনজনই বাড়িটির

দিকে তাকাল। ওপরের তলায় একটি জানালা খোলা। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো—সেই ঘরটিতে বিদ্যুৎ সংযোগই নেই। তাহলে শব্দটা আসছে কোথা থেকে?

নীলয় মুচকি হেসে বলল, “চল, রহস্যটা দেখে আসি।” তারা তখনও জানত না, এই ছোট্ট শব্দই তাদের সামনে এমন একটি রহস্যের দরজা খুলে দেবে, যার উত্তর লুকিয়ে আছে বহু বছর আগের এক ঘটনার মধ্যে।

অধ্যায় ২

# স্টোররুমের দরজা

করিম চাচার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তিন বন্ধু বাড়ির ভেতরে ঢুকল। দরজা খুলতেই পুরোনো কাঠ আর ধুলোর গন্ধ তাদের নাকে এল। নিচতলার ঘরগুলো প্রায় খালি। কোথাও ভাঙা চেয়ার, কোথাও পুরোনো আলমারি, আবার কোথাও দেয়ালে ঝুলছে বিবর্ণ ছবি।

তূর্য ফিসফিস করে বলল, “এই বাড়িতে রাতে কেউ থাকে না তো?” করিম চাচা হেসে বললেন, “মানুষ থাকে না। তবে পুরোনো বাড়ির নিজেরও কিছু শব্দ থাকে। বাতাস ঢুকলে দরজা নড়ে, কাঠ শুকিয়ে গেলে কড়কড় করে—এসবকে রহস্য ভাবার দরকার নেই।”

তিনজন সিঁড়ি দিয়ে ওপরের তলায় উঠল। কাঠের ধাপগুলোতে পা পড়লে কড়কড় শব্দ হচ্ছিল। কিন্তু সেই শব্দের মাঝেও তারা পরিষ্কার শুনতে পেল—টিক... টিক... টিক... শব্দটা শেষ ঘরটি থেকে আসছে। তূর্য দরজা ঠেলে খুলতেই ধুলোর মেঘ উঠল। সবাই একসঙ্গে হাঁচি দিল। ঘরের এক পাশে পুরোনো বাক্স, ভাঙা চেয়ার, বই আর নানা ধরনের জিনিস স্তূপ হয়ে আছে। জানালার কাঁচের এক অংশ ভাঙা, সেখান দিয়ে বিকেলের আলো এসে মেঝেতে লম্বা দাগ ফেলেছে।

হঠাৎ রাফির চোখ আটকে গেল দেয়ালের দিকে। সেখানে ঝুলছে একটি বিশাল কাঠের ঘড়ি। ঘড়িটির কাঠ কালচে হয়ে গেছে, কাচে ধুলোর আস্তরণ। কিন্তু কাঁটাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঘড়িটির কাঁটা থেমে আছে—১২টা ১৭ মিনিটে। নীলয় হাত বাড়িয়ে ঘড়ির নিচের কাঠ ছুঁয়ে বলল, “এটা তো একেবারে বন্ধ। পেছনেও কোনো ব্যাটারি নেই।”

রাফি বলল, “তাহলে টিকটিক শব্দটা?” কেউ উত্তর দিতে পারল না। ঠিক তখনই ঘড়ির ভেতর থেকে আবার একটি শব্দ হলো—টিক! তিনজন একসঙ্গে পিছিয়ে গেল। তূর্য ফিসফিস করে বলল, “এবার কিন্তু আমি নিজে শুনেছি।”

অধ্যায় ৩

# ঘড়ির ভেতরের কাগজ

তূর্যের কথা শুনে রাফি ভয় না পেয়ে ঘড়িটা ভালো করে পরীক্ষা করতে শুরু করল। সে জানত, কোনো রহস্যের প্রথম নিয়ম হলো—ভয় পেয়ে অনুমান না করে যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করা। ঘড়ির নিচের দিকে ছোট একটি কাঠের অংশ একটু বেরিয়ে আছে। রাফি আঙুল দিয়ে চাপ দিতেই—খট্! একটি সরু ঢাকনা খুলে গেল। ভেতরে প্রথমে কিছুই দেখা গেল না।

নীলয় টর্চ জ্বেলে বলল, “ওখানে একটা কাগজ আছে।” রাফি সাবধানে সেটি বের করল। কাগজটি হলুদ হয়ে গেছে এবং কিনারাগুলো ভেঙে যাচ্ছে। বোঝাই যায়, বহু বছরের পুরোনো। কাগজে লেখা—১৭ — ৪ — ২৩ — ৯। তার নিচে একটি বাক্য: “সময় থেমে গেলেও সত্য থেমে থাকে না।”

তিন বন্ধু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তূর্য বলল, “এটা নিশ্চয়ই কোনো কোড।” নীলয় বলল, “অথবা কেউ আমাদের সঙ্গে মজা করেছে। হয়তো অনেক বছর আগে কেউ এখানে এই কাগজ রেখে গেছে।” রাফি মাথা নাড়ল। “দুটোই সম্ভব। কিন্তু আমরা এখনই কোনো সিদ্ধান্ত নেব না। আগে দেখি সংখ্যাগুলোর কোনো অর্থ হয় কি না।”

তারা চারদিকে খুঁজতে শুরু করল। অবশেষে তূর্য একটি পুরোনো আলমারির নিচে হাত ঢুকিয়ে বের করল একটি ছোট ধাতব বাক্স। বাক্সটির ওপর খোদাই করা—. . রাফি কাগজের সংখ্যাগুলোর দিকে আবার তাকাল। তার মনে হলো, রহস্যটি হয়তো একেবারে তাদের হাতের কাছেই আছে।

অধ্যায় ৪

# চারটি সংখ্যা

ধাতব বাক্সটি ছোট হলেও বেশ ভারী। তাতে কোনো চাবির ছিদ্র নেই, বরং চারটি ছোট ঘূর্ণায়মান চাকতি আছে। প্রতিটি চাকতিতে শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা। নীলয় সঙ্গে সঙ্গে বলল, “১৭, ৪, ২৩, ৯—এগুলো কি তালার কোড?”

তূর্য বলল, “একটা সমস্যা আছে। প্রথম ঘরে ১৭ রাখা যায় না, সেখানে তো এক অঙ্কের সংখ্যা।” রাফি কাগজটা আবার দেখল। “তাহলে হয়তো ১৭ মানে প্রথম দুই সংখ্যা—১ আর ৭। তারপর ৪, ২৩ মানে ২ আর ৩, শেষে ৯।” তারা ধীরে ধীরে সংখ্যাগুলো বসাতে শুরু করল।

প্রথম কয়েকটি চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তূর্য বিরক্ত হয়ে বলল, “দেখলি? আমি বলেছিলাম, এটা হয়তো কোনো পুরোনো খেলনা।” রাফি বলল, “ব্যর্থ হওয়া মানে সূত্রটি ভুল—এমন নয়। পদ্ধতিটা ভুলও হতে পারে।”

অবশেষে তারা কাগজে লেখা সংখ্যাগুলো ঠিক যেভাবে আছে সেভাবেই চারটি চাকতিতে বসাল। ক্লিক! তালা খুলে গেল। বাক্সের ভেতরে ছিল একটি পুরোনো ছবি, একটি চিঠি এবং হাতে আঁকা একটি মানচিত্র। ছবিতে তিনজন মানুষ একটি নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনে লেখা—“১৯৩২। বর্ষার আগের শেষ বিকেল।” চিঠির প্রথম লাইন: “যদি কেউ এই চিঠি খুঁজে পায়, তবে সে নিশ্চয়ই ঘড়ির রহস্যও বুঝতে

শুরু করেছে।” মাঝখানের একটি অংশ কালো কালি দিয়ে ঢেকে দেওয়া। নিচে শুধু লেখা—“মানচিত্রে যে জায়গাটি নেই, রহস্যটি সেখানেই।”

অধ্যায় ৫

# মানচিত্রের ফাঁকা জায়গা

রাফি মানচিত্রটি মেঝেতে বিছিয়ে দিল। তূর্য মোবাইলের ম্যাপ খুলে বর্তমান এলাকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে লাগল। পুরোনো নদীটি এখন অনেক সরু। একটি রাস্তা আর নেই। কয়েকটি বাড়ির জায়গায় এখন মাঠ। কিন্তু মানচিত্রের একটি বিষয় তাদের অবাক করল। সেনবাড়ির ঠিক পেছনে একটি বড় বৃত্ত আঁকা, অথচ তার ভেতরে কোনো নাম নেই। শুধু একটি ছোট চিহ্ন—দেখতে অনেকটা তীরের মতো।

নীলয় বলল, “এটা হয়তো কোনো জায়গার চিহ্ন।” রাফি বলল, “কিন্তু চিঠিতে বলা হয়েছে, মানচিত্রে যে জায়গাটি নেই, রহস্যটা সেখানেই।” তূর্য চারপাশে তাকাল। “তাহলে জায়গাটা কোথায়?” কিছুক্ষণ পর রাফি বলল, “নিচে।” দুজনই তার দিকে তাকাল।

—“নিচে মানে?”

—“মানচিত্রটা যদি বাড়ির পুরোনো নকশার ওপর আঁকা হয়, তাহলে যে জায়গাটা ফাঁকা, সেটা হয়তো মাটির নিচে। সেখানে হয়তো কোনো ঘর ছিল।” তূর্য হেসে বলল, “তুই সিনেমা বেশি দেখিস।” রাফি কিছু বলল না। সে ঘড়িটির দিকে তাকাল। কাঁটা এখনও ১২টা ১৭ মিনিটে। রাফির মনে হলো, ঘড়ির সময়টাও নিশ্চয়ই মানচিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত।

তিনজনের কাছে এখন তিনটি প্রশ্ন—. . কে? ১২টা ১৭ কেন? আর মানচিত্রের ফাঁকা জায়গায় কী আছে?

অধ্যায় ৬

# করিম চাচার জানা কথা

পরের দিন তিন বন্ধু আবার সেনবাড়িতে গেল। তারা ঠিক করেছিল, এবার অনুমান না করে পুরোনো বাড়ি সম্পর্কে যত তথ্য পাওয়া যায় সব সংগ্রহ করবে। করিম চাচাকে ঘড়ির কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, “এই ঘড়িটা তোমরা কোথায় দেখেছ?”

—“উপরের স্টোররুমে।” করিম চাচার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। “ও ঘরটা অনেক বছর ধরে খোলা হয়নি।” রাফি জিজ্ঞেস করল, “ঘড়িটা সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?”

করিম চাচা ধীরে ধীরে একটি পুরোনো কাঠের চেয়ারে বসলেন। “অনেক বছর আগে এই বাড়ির মালিক ছিলেন শশাঙ্ক সেন। তিনি পড়াশোনা করা মানুষ ছিলেন। পুরোনো বই, মানচিত্র, ঘড়ি আর নানা ধরনের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতেন।”

তূর্য বলল, “. . তাহলে শশাঙ্ক সেন?” করিম চাচা মাথা নাড়লেন। “সম্ভবত। তাঁর নোটবইয়ে নিজের নামের আদ্যক্ষর ব্যবহার করার অভ্যাস ছিল।” “তারপর তিনি কোথায় গেলেন?” নীলয় জানতে চাইল। করিম চাচা বললেন, “এক রাতে তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে যান। কোথায় গিয়েছিলেন, কেউ নিশ্চিতভাবে জানত না। তাঁর কিছু জিনিসও তখন থেকে আর

খুঁজে পাওয়া যায়নি।” রাফি বুঝল, রহস্যটি শুধু ঘড়ি বা বাক্সের নয়। এর সঙ্গে হয়তো কোনো পুরোনো বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণও জড়িয়ে আছে।

অধ্যায় ৭

# রেকর্ডারের শব্দ

তিন বন্ধু সিদ্ধান্ত নিল, ১২টা ১৭ মিনিটে ঘড়ির কী হয় তা পরীক্ষা করা দরকার। রাতে বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়, তাই তারা ঘড়ির সামনে একটি ছোট রেকর্ডার রেখে এল। রেকর্ডারের সঙ্গে একটি কাগজও লাগিয়ে দিল—“রাত ১১টা ৫০ মিনিট থেকে ১২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত রেকর্ড করো।”

পরদিন সকালে তারা রেকর্ডিং শুনতে বসে। প্রথমে শুধু বাতাসের শব্দ। মাঝে মাঝে জানalos কাঁচ কাঁপছে। দূরে কোনো পাখির ডাক। তারপর ঘড়ির খুব ক্ষীণ শব্দ শোনা গেল। ১১টা ৫৯ মিনিট… ১২টা… কয়েক সেকেন্ড পর—টিক… টিক… টিক…

তারপর ঠিক ১২টা ১৭ মিনিটে একটি পরিষ্কার শব্দ—টিক! কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। এরপর খুব ক্ষীণ একটি শব্দ—খট্। রাফি সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ডিং থামাল। “এই শব্দটা ঘড়ি থেকে আসেনি।”

তূর্য অবাক হয়ে বলল, “তুই কীভাবে বুঝলি?” রাফি বলল, “ঘড়ির টিকটিক আর এই শব্দের প্রতিধ্বনি আলাদা। খট্ শব্দটা যেন শক্ত কোনো কাঠের পেছন থেকে এসেছে।” নীলয় বলল, “তাহলে দেয়ালের পেছনে কিছু আছে?” তারা আবার স্টোররুমে ছুটে গেল। রাফি ঘড়ির চারপাশে কান রাখল। বাইরে তখন দুপুর। তবু ঘরের নীরবতার মধ্যে মনে

হলো, দেয়ালের ওপারে যেন কোনো বন্ধ জায়গা তাদের অপেক্ষা করছে।

অধ্যায় ৮

## দেয়ালের ওপারে

রাফি ঘড়ির চারপাশের দেয়ালে টোকা দিতে শুরু করল। ঠক। ঠক। ঠক। কয়েক জায়গায় শব্দ ভারী, আবার একটি জায়গায় শব্দটা ফাঁপা। তূর্য বলল, “এই জায়গাটা আবার কর।” রাফি একই জায়গায় টোকা দিল। ঠক! এবার তিনজনই বুঝতে পারল, দেয়ালের এই অংশ অন্য জায়গার মতো শক্ত নয়।

নীলয় পুরোনো কাঠের একটি সরু হাতল খুঁজে পেল। হাতলটি দেয়ালের রঙের সঙ্গে মিশে ছিল বলে আগে চোখে পড়েনি। সে ধীরে ধীরে টান দিতেই কাঠের প্যানেল সামান্য নড়ে উঠল। তিনজন মিলে প্যানেলটি সরাল। পেছনে একটি ছোট ফাঁকা জায়গা। সেখানে ধুলোর মধ্যে একটি লোহার বাক্স। বাক্সে কোনো তালা নেই।

ভেতরে পাওয়া গেল একটি নোটবুক। প্রথম পাতায় লেখা—“শশাঙ্ক সেন, ১৯৩১–১৯৩২।” রাফি দ্রুত পাতা উলটাতে লাগল। প্রথম কয়েকটি পাতায় বিজ্ঞান নিয়ে নোট—বাতাসের গতি, নদীর পানির স্তর, বৃষ্টির পরিমাণ এবং মাটির আর্দ্রতা। প্রতিটি তথ্যের পাশে তারিখ ও সময় লেখা। একটি পাতায় লেখা: “প্রকৃতির আচরণ কখনো হঠাৎ বদলায় না। তার আগে সে অনেক ছোট ছোট সংকেত দেয়।” তূর্য বলল,

“নিচের ঘর! তাহলে মানচিত্রের ফাঁকা জায়গাটা সত্যিই মাটির নিচে?” এবার আর কেউ হাসল না।

অধ্যায় ৯

# তিনটি পাথর

নোটবুকের শেষ পাতায় তিনটি পাথরের ছবি আঁকা ছিল। পাথর তিনটি পাশাপাশি, পাশে একটি তীরের চিহ্ন। রাফি ছবিটি মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখল। মানচিত্রের তীরটিও নদীর একটি পুরোনো বাঁকের দিকে নির্দেশ করছে। তারা করিম চাচাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেল। ঝোপঝাড়ের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল। অবশেষে তূর্য চিৎকার করে উঠল, “এখানে এসো!”

মাটির মধ্যে অর্ধেক ডুবে থাকা তিনটি পাথর পাশাপাশি পড়ে আছে। প্রথমটির ওপর খোদাই করা—১২। দ্বিতীয়টির ওপর—১৭। তৃতীয়টিতে কোনো সংখ্যা নেই। নীলয় বলল, “১২টা ১৭! এটাই নিশ্চয়ই ঘড়ির সময়ের সূত্র।” রাফি পাথরগুলোর অবস্থান দেখে বলল, “তৃতীয় পাথরটাই গুরুত্বপূর্ণ।”

তারা পাথরটি একটু সরাতেই নিচে একটি লোহার রিং দেখা গেল। রিংটির চারপাশে কাঠের ঢাকনা মাটির সঙ্গে মিশে আছে। রাফি বলল, “এটা টানার আগে সাবধানে দেখতে হবে।” করিম চাচা রিংটি ধরলেন। তিনি বললেন, “আমি জানতাম, একদিন কেউ না কেউ এটা খুঁজে পাবে।” রিং টানতেই কাঠের ঢাকনা একটু উঠল। নিচে অন্ধকার

সিঁড়ি। তূর্য উত্তেজনায় বলল, “তাহলে সত্যিই একটা গোপন ঘর আছে!”

অধ্যায় ১০

# মাটির নিচের ঘর

করিম চাচা টর্চ জ্বালালেন। সরু সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে সবাই নিচে নামল। নিচে বাতাস ঠান্ডা। দেয়ালে পুরোনো ইট, মেঝেতে ধুলো। কয়েক ধাপ পর তারা একটি ছোট ঘরে পৌঁছাল। ঘরের চারদিকে কাঠের তাক। তাতে পুরোনো বই, মানচিত্র, কাচের বোতল, মাপার যন্ত্র এবং নোটবুক। একটি টেবিলের ওপর ঢাকা দেওয়া একটি বাক্স।

তূর্য চারদিকে তাকিয়ে বলল, “কোথায় সোনা? এত রহস্যের শেষের যদি শুধু বই থাকে, তাহলে কিন্তু আমি হতাশ।” রাফি হাসল। “সব গুপ্তধন সোনা হয় না।” সে টেবিলের ওপর রাখা একটি কাগজ তুলল। তাতে লেখা—“যে জ্ঞান মানুষের কাজে লাগে, সেটিই সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।”

তারা কাগজগুলো পড়তে শুরু করল। শশাঙ্ক সেন বহু বছর ধরে নদীর পানি, বৃষ্টিপাত এবং এলাকার আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, উজানে প্রচুর বৃষ্টি হলে নদীর পানি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যেতে পারে। তিনি একটি সতর্কসংকেতের ব্যবস্থা করেছিলেন। ঘড়ির কাঁটা নির্দিষ্ট সময়ে থামবে এবং গোপন ঘণ্টা একবার বাজবে। ঘড়ির ১২টা ১৭ মিনিট তাই শুধু একটি

সময় নয়—এটি ছিল একটি সংকেত। ঠিক তখন বাইরে বজ্রের শব্দ হলো। তিন বন্ধু একে অপরের দিকে তাকাল।

অধ্যায় ১১

# সতর্কবার্তা

করিম চাচা বললেন, “আজ সকালে নদীর পানি অস্বাভাবিক দ্রুত বেড়েছে।” নীলয় জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। কালো মেঘ জমছে। তূর্য বলল, “কিন্তু এখন তো বর্ষা শুরু হয়নি।” রাফি নোটবুকের তথ্যের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি মিলিয়ে দেখতে লাগল। গত কয়েক দিনের বৃষ্টির খবর, নদীর পানির স্তর এবং উজানের দিকের আবহাওয়া—সবকিছু একসঙ্গে দেখলে বিষয়টি আর হালকা মনে হচ্ছিল না।

রাফি বলল, “আমাদের এখনই বড়দের জানানো উচিত। আমরা নিজেরা সিদ্ধান্ত নেব না, কিন্তু তথ্যগুলো তাদের দেখাতে পারি।” তারা স্থানীয় প্রশাসন, এলাকার দায়িত্বশীল মানুষ এবং আশপাশের পরিবারগুলোকে খবর দিল। প্রথমে অনেকে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিল না। কিন্তু নদীর পানি মাপতে গিয়ে দেখা গেল, সত্যিই পানি দ্রুত বাড়ছে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিচু এলাকার মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা শুরু হলো। রাত গভীর হওয়ার আগে প্রবল বৃষ্টি নামল। নদীর পানি আরও বাড়ল। পরদিন সকালে জানা গেল, উজান থেকে হঠাৎ বিপুল পরিমাণ পানি নেমে এসেছে। আগেই সতর্ক না করলে নিচু এলাকার অনেক পরিবার বিপদের মধ্যে পড়তে পারত। তিন

বন্ধু বুঝ—পর্যবেক্ষণ, যুক্তি এবং দায়িত্বশীলভাবে তথ্য ব্যবহার করাও এক ধরনের শক্তি।

অধ্যায় ১২

# ঘড়িটি আবার চলল

কয়েক দিন পর সেনবাড়ির স্টোররুম পরিষ্কার করা হলো। পুরোনো বই ও নোটবুকগুলো স্থানীয় একটি স্কুলের বিজ্ঞানাগারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হলো। শশাঙ্ক সেনের পর্যবেক্ষণগুলো নিয়ে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। আর সেই পুরোনো ঘড়ি? সেটিও একজন দক্ষ মিস্ত্রির কাছে পাঠানো হলো। অনেক পরিষ্কার ও মেরামতের পর ঘড়িটি আবার চলতে শুরু করল। টিক... টিক... টিক...

তবে একটি অদ্ভুত ব্যাপার রয়ে গেল। ঘড়িটি মাঝে মাঝে ঠিক ১২টা ১৭ মিনিটে কয়েক সেকেন্ডের জন্য থেমে যেত। তূর্য বলল, “এটা নিশ্চয়ই ভূতের কাজ।” নীলয় হেসে বলল, “তোর সব সমস্যার উত্তর ভূত কেন?”

রাফি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, “হয়তো এটা আমাদের মনে করিয়ে দেয়—সময়কে শুধু ঘড়িতে দেখা যায় না। সময়ের সঙ্গে মানুষের কাজ আর সিদ্ধান্তও বদলে যায়।” তূর্য একটু ভেবে বলল, “আর কোনো রহস্য দেখলে ভয় পাওয়ার আগে প্রশ্ন করতে হয়।” নীলয় যোগ করল, “উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত খুঁজতে হয়।” তিনজন হেসে উঠল। ঘড়ির কাঁটা আবার এগিয়ে চলল। কিন্তু গল্প এখানেই শেষ হওয়ার কথা ছিল না। কারণ রাফির ব্যাগে তখনও সেই পুরোনো মানচিত্রটি রয়ে গেছে।

অধ্যায় ১২ এর পর

# দ্বিতীয় রহস্যের দরজা

বাড়ি ফেরার আগে রাফি আবার মানচিত্রটি বের করল। সে মানচিত্রের সামনের অংশ বহুবার দেখেছে। কিন্তু এবার আলোটা একটু অন্যভাবে পড়ায় নিচের কোণায় খুব ছোট একটি লেখা চোখে পড়ল। লেখাটি ছিল—“প্রথম রহস্যের উত্তর পেলে দ্বিতীয়টির দরজা খুলবে।”

রাফি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তূর্য বলল, “কী হলো? আবার কিছু পেলি?” রাফি মানচিত্রটি ভাঁজ করে ব্যাগে রাখল। তার মুখে রহস্যময় হাসি। নীলয় সন্দেহের চোখে তাকাল। “তুই কিছু পেয়েছিস।” “হয়তো।” “কী?”

রাফি উত্তর দিল না। শুধু বলল, “আগামী শুক্রবার আবার আসবি?” তূর্য বিরক্ত হয়ে বলল, “আবার রহস্য?” রাফি এবার মানচিত্রের পেছনের অংশ দেখাল। সেখানে আগে না দেখা একটি ছোট চিহ্ন—একটি নৌকা। তার নিচে লেখা: “যেখানে নদী শেষ হয়, সেখান থেকেই পথ শুরু।” তিন বন্ধু একে অপরের দিকে তাকাল। সেনবাড়ির রহস্য শেষ হয়নি। বরং প্রথম রহস্যের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তারা এমন একটি সূত্র পেয়েছে, যা তাদের নিয়ে যেতে পারে নদীর অন্য প্রান্তে।

উপসংহার

# গল্প থেকে যা শিখলাম

**১. কৌতূহলকে প্রশ্নে পরিণত করো:** অদ্ভুত কিছু দেখলে ভয় বা গুজবের ওপর নির্ভর না করে প্রশ্ন করো এবং তথ্য খুঁজে দেখো।

**২. প্রমাণ ছাড়া সিদ্ধান্ত নয়:** একটি ধারণা সত্যি মনে হলেও সেটি যাচাই করা দরকার। পর্যবেক্ষণ, তথ্য ও যুক্তি সিদ্ধান্তকে শক্ত করে।

**৩. তথ্য মিলিয়ে দেখো:** পুরোনো তথ্য একা যথেষ্ট নয়। বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে তার প্রকৃত অর্থ বোঝা যায়।

**৪. প্রকৃতির ছোট সংকেত লক্ষ্য করো:** বৃষ্টি, নদীর পানি, বাতাস বা অন্য পরিবর্তন কখনো কখনো বড় ঘটনার আগাম সংকেত হতে পারে।

**৫. জ্ঞান মানুষের কাজে লাগাও:** শেখা জ্ঞান নিজের মধ্যে আটকে না রেখে প্রয়োজনের সময়ে দায়িত্বশীলভাবে অন্যদের উপকারে ব্যবহার করা যায়।

---

* কিশোর রহস্যগল্প: "বন্ধ ঘড়ির রহস্য" | পরিবেশনায়: ক্যাটালগ পাবলিকেশনস (www.catalog.com.bd)